Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাঈসা হাসান নিশু

রোলঃ 20202531228

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রাঈসা হাসান নিশু

রোলঃ 20202531228

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রাঈসা হাসান নিশু, আইডিঃ 20202531228 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: শারাফাত কারীম
এরাবিক ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

রাঈসা হাসান নিশু

আইডিঃ 20202531228

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

কুরআনে সাহাবাগনের মর্যাদা 6

রাসূল (সা)-এর হাদীসে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা 8

সাহাবায়ে কেরাম নবীগণের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ 11

সাহাবা (রা)-গণ সমালোচনার ঊর্ধ্বে 12

রাসূল (সা)-এর দৃষ্টিতে সাহাবায়ে কেরামগণ 12

সাহাবায়ে কেরামের উত্তম গুণাবলী 13

রাসূল (সা)-এর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন 15

সাহাবাদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের বিচার 18

সর্বপ্রথম ইসলামগ্রহণকারী সাহাবাগণ 19

হযরত হামজা (রা) ও উমার (রা)-এর ইসলামগ্রহন 21

দ্বীনের পথে সাহাবাদের প্রচেষ্টা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কুরবানী 22

জিহাদের ময়দানে সাহাবাদের বীরত্বের নমুনা 26

রেফারেন্স 29

ভূমিকা

রাসূল (সা) এর সুন্নাহের পর সর্বকালের মানুষের জন্য উত্তম আদর্শ সাহাবীগনের জীবন। রাসূল(সা) এর সুন্নাহের সর্বোত্তম ঝান্ডাধারী ছিলেন সাহাবায়ে কেরামগণ। তঁআদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অবধি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রাসুল (সা) এর আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে। সাহাবারা ছিলেন সেই প্রজন্ম যারা নবীজি (সা) এর সুন্নাহের ধারক ও বাহক, তাঁর সাহচর্য লাভে সদা আকুল, জিহাদের ময়দানে তাঁর জন্য জান কুরবান করতে প্রস্তুত, নব্যুওয়াতের দীর্ঘ সফরে নবীজির (সা) অবিচল সঙ্গী।

কুরআনে সাহাবাগনের মর্যাদা

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় সাহাবায়ে কেরাম রা এর প্রশংসা করেছেন। তাদের মর্যাদা ও অবস্থান তুলে ধরেছেন।

১)

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনছারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কানন-কুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা। (সুরা আত-তাওবাঃ আয়াত ১০০)

২) অপর এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমন্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন । তওরাতে তাদের অবস্থা

এরূপ এবং ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কান্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে-চাষীকে আনন্দে অভিভুত করে-যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও মহাপুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। (আল ফাতহ-২৯)

৩) সুরা হাশরে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করেছেন-

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَـٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

"এই ধন-সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিলাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ তাঁর রসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিস্কৃত হয়েছে। তারাই সত্যবাদী।" (সুরা হাশর-৮)

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

"যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুহাজিরদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষাপোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম।" (সুরা হাশর-৯)

৪) আল্লাহ তায়ালা কুরআনে সাহাবাগণের সম্পর্কে বলেছেন-

لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। (সুরা ফাতহ-১৮)

৫) কুরআনের অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেছেন-

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি।(সুরা আহযাব-২৩)

৬) সুরা হুজুরাতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَـٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনার পর সন্দেহ পোষণ করে না এবং আল্লাহর পথে প্রাণ ও ধন-সম্পদ দ্বারা জেহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ। (সুরা হুজুরাত-১৫)

৭) অপর এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

أُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

তারাই হল সত্যিকার ঈমানদার! তাদের জন্য রয়েছে স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক রুযী।(সুরা আনফাল-৪)

রাসূল (সা)-এর হাদীসে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা

১. বোখারী-মুসলিমের সহীহ হাদীসে রয়েছে,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

হযরত ইমরান বিন হুসাইন রা. থেকে বর্ণিত, রসূল (স.) বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম তারা যারা আমার যুগে রয়েছে। অতঃপর তাদরে পরবর্তী যুগের উম্মাত (তথা তাবেয়ীগনের যুগ) অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগের উম্মাত। (অর্থাৎ, তাবয়ে তাবেয়ীনের যুগ) (বুখারী ৪/২৮৭- ২৮৮- মুসলিম ৪/১৯৬৪)

২. সাহাবাদের মর্যাদা সম্মন্ধে হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছেনঃ

الله الله فى أصحابى لا تتخذوهم غرضا من بعدى فمن أحبهم فبحبى أحبهم ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم

অর্থাত-সাবধান!তোমরা আমার সাহাবীগণের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। আমার পরে তোমরা তাঁদেরকে (তিরস্কারের) লক্ষ্যবস্তু বানাইও না। যে ব্যক্তি তাঁদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করে সে আমার প্রতি ভালোবাসা বশেই তাঁদেরকে ভালোবাসে। আর যে ব্যক্তি তাঁদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে সে আমার প্রতি বিদ্বেষবশতঃ তাঁদের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে থাকে"।(তিরমিযী-৩৮৬১, ইবনে হিব্বান, হা. ২২৮৪, মুসনাদে আহমদ, খ.৪, পৃ.৮৭, আস-সুন্নাহ, ইবনে আবি আসেম, হা.৯৯২)

৩. তিনি আরো ইরশাদ করেছেনঃ

لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِى فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ

অর্থাত-তোমরা আমার সাহাবীদেরকে গালি দিওনা। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ উহুদ সমপরিমাণ স্বর্ণও যদি আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে,তবেও তাঁদের এক মুদ্দ বা তার অর্ধেক পরিমাণ(এক মুদ=১ রতল। আল্লামা শামী(রাঃ)বয়ান করেছেন যে, এক মুদ্দ ২৬০ দিরহামের

সমপরিমাণ। দ্রষ্টব্যঃ আওযানে শরিয়্যাহ)আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার সমতূল্য হবেনা।(সহি বুখারী-হাদিস নং ৩৭১৭)

৪. হযরত ইবনে আব্বাস(রাঃ)হতে বর্ণিতঃ রাসুলুলুল্লাহ(সঃ) ইরশাদ করেছেন- " من سب اصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين ". অর্থাৎ -"যারা আমার সাহাবীদেরকে গালী দেয়, তাদের প্রতি আল্লাহর,ফেরেস্তাদের,এবং জগতবাসীর অভিশাপ বর্ষিত হোক।(তাবরানী ফিল কাবির, হা.১২৭০৯)

৪. হযরত উমর রা. থেকে বর্ণিত রাসূল স. বলেন,

اكرموا أصحابى فإنهم خياركم

অর্থাৎ-তোমরা আমার সাহাবীগণকে সম্মান কর। কেননা তাঁহারা তোমাদের মধ্যকার উত্তম মানব।

[মুসনাদে আহমাদ, খ.১, পৃ.১১২, তাহকীক, আহমাদ শাকের, নাসায়ী, হাকেম, মেশকাত, খ.৩, পৃ.১৬৯৫]

৫. হযরত আবু বুরদাহ(রাঃ) হতে বর্ণিত যে,রাসুলুলুল্লাহ(সঃ) ইরশাদ করেছেন যে

عن أبى بردة رضي الله عنه قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم – النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون ، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون.

অর্থঃ নক্ষত্র সমুহ আসমানের জন্য আমানত স্বরুপ। যখন নক্ষত্রগুলি বিলুপ্ত হয়ে যাবে,তখন আসমানকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কেয়ামত চলে আসবে। এবং আমি আমার সাহাবীদের জন্য আমানত স্বরুপ। অতএব যখন আমি ইহকাল ত্যাগ করব তখন তাঁদেরকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তাঁদের(সাহাবাদের) মধ্যে ইজতেহাদি মতানৈক্য দেখা দিবে। এবং আমার সাহাবীরা উম্মতের জন্য আমানত স্বরুপ। অতএব যখন তাঁদের যুগের অবসান ঘটবে তখন আমার উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ফেতনা-ফ্যাসাদের সুত্রপাত ঘটবে। [মুসলিম শরীফ, হা.২৫৩১]

৬. ইরবায ইবনে সারিয়া(রাঃ)হতে বর্ণিত যে,রাসুলুল্লাহ(সাঃ)ইরশাদ করেছেনঃ

قال النبى صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتى وسنة خلفاء الراشدين المهدين

অর্থঃ আমার এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীন রা. এর সুন্নতকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরবে। (আবু দাউদ হা.৪৬০৭,তিরমিযী-২৮৯১,ইবনে মাজা [ভূমিকা, ৪২], মুসনাদে আহমদ হা.১৭৬০৬, মুসনাদে বাযযার,ইবনে হিব্বান,মুসতাদরাক লিল-হাকিম,তারীখে দিমাশক লি-ইবনে আসাকির, আল-মু'জামুল কাবীর, হা. ৬২৩, আল-আওসাত, আল-কাবীর লিত্তাবরানী)

৭. রাসুলে কারীম(সাঃ) সমস্ত উম্মতকে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলে গেছেনঃ

ستفترق أمتى ثلاثا وسبعين فرقة كلهم فى النار إلا واحدة : قالوا من هى يا رسول الله! قال: ما أ
نا عليه وأصحابى

অর্থঃ“ অতিশীঘ্র আমার উম্মত তেহাত্তর(৭৩) ফের্কায় বিভক্ত হয়ে পড়বে। তন্মধ্যে মাত্র একটি দলই মুক্তিপ্রাপ্ত এবং জান্নাতী হবে। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেনঃ সেই মুক্তিপ্রাপ্ত সৌভাগ্যশালী দলটি কারা এবং এত বড় সৌভাগ্য লাভের ভিত্তি কোন নীতি বা আদর্শের উপর ? উত্তরে নবী(সাঃ) বললেন,যে নীতি,তরীকা ও আদর্শের উপর আমি এবং আমার সাহাবায়ে কেরাম আছেন।(তিরমিজী শরীফ, হা.২৬৪০, ইবনে মাজা, হা.৪৭৯, মুসনাদে আহমদ খ.৪, পৃ.১০২, আল-মুসতাদরাক, খ.১, পৃ.১২৮)

৮. হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত রাসূল স. বলেন,

آية الإيمان حب الأنصار ، وآية النفاق بغض الانصار

অর্থ: ঈমানের নিদর্শন হলো, আনসারী সাহাবীদের মহব্বত এবং মুনাফেকীর নিদর্শন হলো, আনসারীদের প্রতি বিদ্বেষপোষণ। [বোখারী শরীফ, খ.৭, পৃ.১১৩, মুসলিম শরীফ, হা.৭৪, ইমান অধ্যায়]

৯. রাসূল স. ইরশাদ করেন,

لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني وصحبني، والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأي من رآني وصاحبني

অর্থ: তোমরা ততোদিন পর্যন্ত কল্যাণের মাঝে থাকবে যতক্ষণ তোমাদের মাঝে আমাকে যারা দেখেছে এবং আমার সংস্পর্শে থেকেছে তারা বর্তমান থাকবে। আল্লাহর শপথ, তোমরা কল্যানের মাঝে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের মাঝে এমন লোক থাকবে, যারা আমার সাহাবী ও সংস্পর্শ অবলম্বনকারীদেরকে দেখেছে।

[মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, খ.১২, পৃ.১৭৮, ত্ববরানী ফিল কাবির, খ.২২, পৃ.৮৫, ফাতহুল বারী, খ.৫, পৃ.৭]

সাহাবায়ে কেরাম নবীগণের পর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ

সাহাবাগণের মর্যাদা অসাধারণ পর্যায়ের ছিল। তাঁদের সমাজ ছিল একটি আদর্শ মানবসমাজ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁদের সততা, বিশ্বাস্ততা, ভদ্রতা, আত্মত্যাগ, সদাচরণ, আল্লাহভীতি, তাকওয়া, ইহসান, সহানূভুতি, বীরত্ব, সাহসীকতা সবই ছিল নজীর বিহীন। তাঁরা ছিলেন নিষ্কলুষ ও পবিত্র চরিত্রের অধিকারী। সাহাবাগণ হলেন সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মানব এবং রাসূল (সা)-এর আদর্শের মূর্ত প্রতীক।

রাসূল (সা) আমাদের জানিয়েছেন, নবী রাসূলগণের পর আল্লাহ তায়ালা সমস্ত মানবজাতির উপর চার খলিফা- আবু বকর (রা), উমার (রা), উসমান (রা) ও আলী (রা) কে মনোনীত করেছেন এবং সকল সাহাবীদের উপর তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। দুনিয়ায় জান্নাতের সুসংবাদ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন সাহাবীদের মধ্যেই দশ জন, যাদের মধ্যে চারজন সম্মানিত মহান খলিফাগণ, তালহা (রা), যুবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা), সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস (রা), সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা), আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা) এবং আবু উবাইদা (আমির) ইবনুল জাররাহ (রা)। এছাড়াও নবিজির (রা) বিবিগণ, ফাতিমা (রা), হাসান ও হুসাইন (রা), হামযা (রা) প্রমুখ পরিবারের সদস্য ও সাহাবীগণ জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ছিলেন।

সাহাবা (রা)-গণ সমালোচনার উর্ধ্বে

পবিত্র কুরআনে সাহাবাদের সম্পর্কে ঘোষণা এবং প্রশংসার পর কোন মুসলমানই তাদের সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা বা সমালোচনা করতে পারে না। স্বয়ং আল্লাহ যাদের প্রশংসা করে সততা, হিদায়েত ও ন্যায়নিষ্ঠ প্রভৃতির উপাধি এবং স্বাক্ষ্য শাহাদাত ঘোষণা করেছেন, তাদের সম্বন্ধে বিপরীত ধারণা, সমালোচনা এবং ভালো মন্দ বিচার করতে যাওয়া সুস্পষ্টত আল্লাহর ঘোষণায় অনাস্থা ব্যতীত আর কিছুই নয় এবং বলা বাহুল্য যে, কোন মুসলমান এই ধরনের অভিশপ্ত ধারণা এবং দুঃসাহস করতে পারে না।

রাসূল (সা)-এর দৃষ্টিতে সাহাবায়ে কেরামগণ

পবিত্র কুরআনে সাহাবাদের উচ্চ প্রশংসা করে তাদেরকে হিদায়াতের মানদন্ড বলে ঘোষণা করে, তাদের ঈমান ও আদর্শকে পরবর্তীদের ঈমান আমলের শুদ্ধা শুদ্ধির কষ্টিপাথর রূপে নির্নিত করেছে, এটাই শেষ নয়, বরং রাসুল (সা) ও অনুরূপ সুস্পষ্টভাবে সাহাবাদের উচ্চপ্রশংসা করে তাদের আদর্শ অবশ্যই উম্মতকে অনুসরণ করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তাদের সমালোচনা ও স্বকীয়তা বিনষ্ট করার অভিশপ্ত প্রচেষ্টা হতে রাসুল (সা) এর অনুসারীগণকে বিরত থাকতে সুস্পষ্ট ভাষায় কঠোরভাবে নির্দেশ প্রদান করেছেন।

হযরত উমার (রা) হতে বর্ণিত একদিন রাসূল (সা) সাহাবাদের অন্তর্বিরোধ সম্পর্কে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞেস করলে অহী আসে "মোহাম্মদ! তোমার সাহাবাগণ আমার কাছে আসমানের প্রতীক ;যে কেউ তাদের কোন আদর্শ অনুসরণ করবে, সে সুনিশ্চিত হেদায়াত লাভ করবে ।" রাসূল(সা) ঘোষণা করে বলেন- আমার সাহাবগন নক্ষত্র সদৃশ;তাদের যেকোনো জনের অনুসরণে তোমরা হেদায়েত লাভ করবে। রাসুল (সা) বলেন, আমার উম্মতের মধ্যে একটি আদর্শের অনুসরণেই নিশ্চিত জান্নাত এবং মুক্তি লাভ করবে। সাহাবাদের এ জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বলেন – যারা আমার উম্মত এবং আমার সাহাবাদের আদর্শের সুপ্রতিষ্ঠিত পথে অবিচলিত রয়েছে। (মিশকাত) তিনি আরো বলেন- আমার অবর্তমানে তোমরা আবু বকর ও উমার (রা) এর অনুসরণ করবে।

রাসুল (সা) সাহাবাদের সমালোচনা নিষিদ্ধ করে বলেন, আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি- তোমরা আমার সাহাবাদের সমালোচনা করবে না। মনে রেখো তাদের প্রতি বিদ্বেষ, ভালোবাসা প্রকান্তরে আমার প্রতি বিদ্বেষ, ভালোবাসা বই কিছু নয়।(তিরমিযী;শিফা)

আমার সাহাবাদিগকে তোমরা গালি দেবে না। মনে রাখবে আল্লাহ পথে তাদের যে কেউ মুষ্টিমেয় যব দান করেছেন, তোমরা ভুবন ভরা স্বর্ণও রৌপ্য দান করেও তাদের সে এক মুষ্টি জবের মর্যাদা লাভ করতে পারবে না। (তিরমিযী)

সহীহ বুখারীতে রয়েছে, হিজরি দ্বিতীয় শতকের বিখ্যাত মুহাদ্দিদ মুয়াফা ইবনে ইমরান(রা) বলেন- পরবর্তী যুগের যত বর মণীষীই হন নাকেন, সাহাবাদের সাথে কারো তুলনা হয়না। এমনকি হযরত উমার ইবনে আব্দুল আযীয (রহ) তাঁর অতুলনীয় মহত্ব সত্ত্বেও আমীর মুয়াবিয়া(রা)-এর সম মর্যাদা সম্পন্ন হওয়া তঁ দুরের কথা, তাঁর ধারে কাছেও যেতে পারেন না।“

হযরত সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ তসতরী(রা) বলেন, “যে ব্যাক্তি সাহাবাদের সম্মান করে না এবং তাঁদের নির্দেশাবলীর গুরুত্ব দেয় না, সে কখনো প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না।“

সাহাবায়ে কেরামের উত্তম গুণাবলী

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে যেমন সার্বিকভাবে সাহাবীগণের প্রশংসায় বিভিন্ন আয়াত নাযিল করেছেন একইসাথে সুনির্দিষ্ট কিছু সাহাবা (রা) এর প্রশংসা ও উত্তম গুণাবলীও উল্লেখ করেছেন।

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যুবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি।(সুরা আহযাব-২৩)

এ আয়াত দ্বারা সাহাবা কেরামের বহু গুণের কথা প্রমাণিত হয়েছে যথা-

১) সততা ও অঙ্গীকারে দৃঢ়তা। কারন তাঁরা তাঁদের রব ও রাসূল (সা)-এর সাথে যেসব ওয়াদা করেছেন সেগুলো পূরন করেছেন।

২) স্বীয় জান-মাল বিসর্জন দিয়ে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করা তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সাহাবায়ে কেরাম শাহাদাত বনণ করার জন্য সর্বদা উৎসুক ও প্রতীক্ষমান ছিলেন।

لكن الله حبب إليكم الإيمان و زينه في قلوبكم و كره إليكم الكفر و الفسوق و العصيانط أولئك هم الراشدون

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তোমাদের অন্তরে ঈমানের মহব্বত সৃষ্টি করে দিয়েছেন। পান্তরে কুফর, শিরক, পাপাচার ও নাফরমানির প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তারাই (সাহাবীগণ) সৎপথ অবলম্বনকারী। (সূরা হুজুরাত-৮)

উক্ত আয়াত দ্বারাও সাহাবায়ে কেরামের কতিপয় গুণ প্রমাণিত হয়েছে-

১) আল্লাহ তায়ালা তাঁদের ঈমাঙ্কে প্রিয় বস্তু করে দিয়েছেন।

২) ঈমান তাঁদের অন্তরে সুসজ্জিত করে দিয়েছিলেন।

৩) কুফর এবং অন্যান্য সমস্ত নাফরমানীর প্রতি তাঁদের অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। এছাড়াও সাহাবায়ে কেরামগণ ছিলেন অতুলনীয় চরিত্রের অধিকারী। দৈনন্দিন প্রতিটি কাজে তাঁরা রাসূল (সা)-এর আদর্শ অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন। তাঁদের অন্তরে রাসূল (সা)-এর প্রতি সম্মান ও ভালবাসা এতই ছিল যে তাঁরা সরাসরি রাসূল (সা)-এর চেহারা মুবারকের দিকে তাকাতে লজ্জা পেতেন। রাসূল (সা)-এর যেকোন আদেশ মানতে তাঁরা সামান্যতম সময় ব্যয় করতেন না।

রাসূল (সা)-এর প্রতি সাহাবায়ে কেরামের ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন

মহান আল্লাহর হুকুম ছিল,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রসূলের (সাঃ) আনুগত্য কর এবং নিজেদের কর্ম বিনষ্ট করো না। (সূরা মুহাম্মাদ ৩৩)

لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

যাতে তোমরা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁকে সাহায্য ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা কর। (সূরা ফাতহ ৯)

আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহঃ) বলেন, ‘‘যার মাঝে দুটি বিষয় পাওয়া যাবে সে নাযাত পাবে।‘‘ একটি হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর সৃষ্টির শানে সততা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে রাসূল(সা)-এর প্রতি ভালবাসা। তাই সাহাবাগণ তাঁর জন্য হয়ে গেলেন নিবেদিত প্রাণ। রাসূল (সা)-এর অনুকরণ, আনুগত্য ও ভালবাসায় তাঁরা পরস্পর প্রতিযোগিতা করতেন। তাঁর আদেশ নিষেধ পালন করতে কোন দ্বিধা ও কুন্ঠাবধ ছাড়াই তাঁরা সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন। সুন্নাহর হিকমত ও যৌক্তিকতা বুঝে না এলেও সাহাবাগন তা পালন করতে কুন্ঠাবোধ করতেন না, ভক্তির সাথে অনুকরণ করে যেতেন। একদা উমার (রা) হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন দেওয়ার সময় বলেছিলেন, ‘‘ আল্লাহর কসম! আমি তোমাকে চুমা দিচ্ছি। অথচ আমি জানি যে, তুমি কোন উপকার করতে পাআর না, অপকারও না। তবে যদি আমি আল্লাহর রাসূল (সা) কে চুম্বন দিতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুম্বন দিতাম না।‘‘

যে সাধারন খাবার রাসূল (সা) খেতে ভালোবেসেছেন, সেই খাবার তাঁর মহব্বতে খেয়ে তাঁর সুন্নত পালন করেছেন সাহাবাগণ। কী অপূর্ব অনুকরন ও অনুসরনণের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তাঁরা!

একদা এক খাবারের মজলিশে আনাস (রা) রাসূল(সা) কেলাউ খেতে পছন্দ করতে দেখলেন আর তখন থেকেই তিনি নিজে লাউ খেতে ভালোবাসতে লাগলেন। (আহমাদ, সিলসিলাহে সহীহাহ ৫/১৬৩)

এমন কি সাহাবী আবদুল্লাহ বিন উমার (রা) আল্লাহর রাসূল (সা)-এর নামাজের জায়গা খুজে সেই জায়গায় নামাজ পড়তেন। তিনি যে গাছের নিচে বিশ্রাম নিয়েছেন, সেই গাছের নিচে তিনিও বিশ্রাম নিতেন এবং সেই গাছ যাতে মারা না যায় তাঁর জন্য তাঁর গোড়ায় পানি দিতেন।(উসুদুল গাবাহ ৩/৩৪১, সিয়ারু আ'লামুন নুবালা ৩/২১৩)

তাঁর আচরণে নবীজির (সা) অনুসুরণ দেখলে মনে হতো তিনি একজন পাগল লোক।(সিয়ারু আ'লামুন নুবালা ৩/২১৩)

সাহাবীগণ যখন রাসূল (সা)-এর নিকট থেকে কিছু বর্জন করার আদেশ শুনতেন, তখন লোভনীয় হলেও তা বিনা দ্বিধায় সত্বর বর্জন করতেন।

মদ যখন হারাম করা হল, তখন সাহাবাগণ মদের বড় বড় পাত্র ভেঙ্গে দিলেন এবং কোন কোন পাত্র থেকে মদ ঢেলে ফেলে দিলেন। আর তাঁর ফলে মদীনার গলিতে মদ প্রবাহিত হল।(বুখারী, মুসলিম ১৯৮০)

অতঃপর সেই অভ্যাসগত নেশার জিনিস আর কেউ ভক্ষন করলেন না।

শুধু পুরুষরাই নয়; বরং মহিলারাও রাসূল (সা)-এর অনুসরণের বিস্ময়কর সব দৃষ্টন্ত রেখে গেছেন। তারাও প্রমাণ করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল(সা)-এর আদেশ পালনে এতটুকু দেরী, মনের ভিতরে কোন দ্বিধা-সংকোচ, কেন-কিন্তু রাখা চলবে না। এক সময় পুরুষ ও মহিলাদেরকে এক সঙ্গে পাশাপাশি রাস্তায় চলতে দেখে নবী (সা) বলেছিলেন," হে মহিলাগণ! তোমরা পিছিয়ে যাও। পথের মধ্যভাগে চলা তোমাদের জন্য সমীচীন নয়; বরং তোমরা পথের এক পাশ দিয়ে চলাচল কর।" মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে দেওয়াল ঘেষে চলতে লাগল যে, তাঁর ফলে তাঁদের দেহের পরিহিত কাপড় দেওয়ালে আটকে যেতে লাগল!(আবু দাউদ ৫২৭২)

একদা জনৈক মহিলা তাঁর কন্যাকে সঙ্গে করে রাসূল(সা)-এর নিকট উপস্থিত হল। তাঁর মেয়ের হাতে দুই খানা সোনার মোটা বালা ছিল। তা দেখে নবী (সা) বল্লেন,"তুমি এর যাকাত প্রদান কর কি?" সে বলল, "না।" তিনি (সা) বল্লেন,"তাহলে তুমি কি পছন্দ কর যে, এই দুই খানা বালার পরিবর্তে কিয়ামতের দিন আল্লহ তোমাকে আগুনের তৈরি দুই খানা বালা পরিধান করাবেন!"

সঙ্গে সঙ্গে মহিলাটি বালা দুটি খুলে রাসুল (সা)-এর সামনে রেখে দিয়ে বলল, "এই বালা দুই খানা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য।" (আবু দাউদ ১৫৬৩,নাসাঈ)

ভালোবাসার নবীকে তাঁরা সর্বদা চোখে চোখে রাখতেন। ক্ষণিকের তরে কোথাও অদৃশ্য হলে তাঁরা উদ্বিগ্ন হতেন, তাঁর বিপদের আশংকায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতেন, তাঁর খোজ শুরু করতেন।

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, একদা আমরা আল্লাহর রাসূল (সা)-এর চারিপাশে বসেছিলাম। আমাদের সাথে আবু বাকর ও উমার (রা) এবং অন্যান্য সাহাবীগণ ও ছিলেন। এমতাবস্থায়

তিনি(সা) আমাদের মাঝ থেকে উঠে চলে গেলেন। যখন ফিরে আসতে দেরি করলেন তখন আমাদের আশংকা হল যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে তিনি শত্রু কবলিত না হন। এ দুশ্চিন্তায় আমরা ঘাবড়ে গেলাম ও উঠে পড়লাম। তাঁদের মধ্যে আমিই সবপ্রথম ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। সুতরাং আমি রাসুলুল্লাহ (সা)-এর সন্ধানে বেড়িয়ে পড়লাম। শেষ পর্যন্ত আমি আনসারদের বনূ নাজ্জারের একটি বাগানে পৌছে তাঁর চতুর্দিকে ঘুরতে লাগলাম, যদি কোন দরজা পাই। কিন্তু তাঁর কোন দরজা পেলাম না। হঠাত দেখলাম বাইরের একটি কুয়া থেকে সরু নালা ঐ বাগানের ভিতর চলে গেছে। আমি সেখান দিয়ে জড়সড় হয়ে বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। দেখলাম রাসুলুল্লাহ (সা) সেখানে উপস্থিত। তিনি বলে উঠলেন, “আবু হুরাইরা!” আমি বললাম, ‘জ্বী হ্যা আল্লাহর রাসূল!’ তিনি বল্লেন,”কী ব্যাপার তোমার?” আমি বল্লাম,’আপনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু হঠাত উঠে বাইরে এলেন। তারপর আপনার ফিরতে দেরি দেখে আমরা এই দুশ্চিন্তায় আক্রান্ত হয়ে পড়ি যে, আমাদের অনুপস্থিতিতে হয়ত আপনি শত্রু কবলিত হয়ে পড়বেন। যার ফলে আমরা সকলে ঘাবড়ে উঠলাম। সর্বপ্রথম আমিই বিচলিত হয়ে উঠে এই বাগানে এসে জড়সড় হয়ে শিয়ালের মত ঢুকে পড়লাম। আর সব লোক আমার পিছনে আসছে।‘ তিনি আমাকে সম্বোধন করে তাঁর জুতা জোড়া দিয়ে বল্লেন,”আবু হুরাইরা!আমার এ জুতা জোড়া সঙ্গে নিয়ে যাও এবং এ বাগানের বাইরে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লহ’ অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে পাঠকারী যে কোন ব্যাক্তির সাথে তোমার সাক্ষাত হবে, তাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও।“(মুসলিম ১৫৬)

সাহাবাদের মাঝে শ্রেষ্ঠত্বের বিচার

আল্লাহ তায়ালা কতৃক প্রেরিত নবী রাসূলগণ মানজাতির নিকট সমান হলেও মর্যাদায় তাঁরা এক নন। ঠিক তেমনি সাহাবায়ে কেরামগণ সম্মান ও ভালবাসার নিরিখে আমাদের নিকট সমান হলেও মর্যাদায় সকলে সমান নন। তাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কুরবানী স্থান কাল অনুপাতে ভিন্ন ভিন্ন মাহাত্ম্য রাখে। বিশিষ্ট উলামাগণ উল্লেখ করেছেন যে মরযাদার ভিত্তিতে সাহাবাগণের ১২ টি স্তর রয়েছে-

১) যারা সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহন করেন যেমনঃ আবু বাকর, উমার, উসমান ও আলী (রা)।

২) যারা দারুন নাদওয়াতে জমায়েত হয়ে ইসলামে দীক্ষিত হন।

৩) যারা হাবশায় হিজরত করেন।

৪) যারা প্রথম আক্কাবায় বায়আতঁ করেন।

৫) যারা দ্বিতীয় আক্কাবায় বায়আতঁ করেন।

৬) যারা হিজরত করে রাসূল (সা) এর সাথে কুবায় মিলিত হন।

৭) যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহন করেন।

৮) যারা বদর যুদ্ধ ও হুদায়বিয়্যাহ্র সন্ধির অন্তর্বর্তীকালে হিজরত করেছেন।

৯) যারা হুদায়বিয়্যাহতে "বাইআতুর রিদওআন" এ অংশগ্রহন করেছেন।

১০) যারা হুদায়বিয়্যাহ ও মক্কা বিজয়ের অন্তর্বর্তীকালে হিজরত করেছেন। এমন সাহাবাদের সংখ্যা অনেক। এদের মধ্যে ছিলেন খালিদ বিইন ওয়ালিদ, আমর বিন আস, আবু হুরাইরা প্রমুখ সাহাবাগণ।

১১) যারা মক্কা বিজয়ের দিন ইসলামে দীক্ষিত হন।

১২) যারা শিশু অবস্থায় মক্কা বিজয়ের দিন অথবা বিদায়ী হজ্জের সময় রাসূল(সা)-এর দর্শনলাভ করেছেন।

তাঁদের মর্যাদার তারতাম্যের ঘোষনা করে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَـٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

তোমাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কিসে বাধা দেয়, যখন আল্লাহই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের উত্তরাধিকারী? তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জেহাদ

করেছে, সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যদা বড় তাদের অপেক্ষা, যার পরে ব্যয় করেছে ও জেহাদ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। (সূরা হাদীদ ১০)

সর্বপ্রথম ইসলামগ্রহণকারী সাহাবাগণ

প্রথম নবুওয়্যাতপ্রাপ্তির সময় আসন্ন। রাসূল(সা) হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন। এমন সময়ে জিবরীল (আ) এলেন, নাযীল হল পবিত্র কুরআনের পাঁচ আয়াত। জিবরীল (আ) কে দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে যখন রাসূল (সা) ফিরে উম্মুল মুমিনীন খাদিজা (রা) কে বর্ণনা করলেন, তখন তিনি তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, " কখনো না। আপনি সুসংবাদ নিন। আল্লাহর কসম! আপনি তো আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখেন, সত্য কথা বলেন, (অপরের) বোঝা বইয়ে দেন, মেহমানের খাতির করেন এবং বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করেন।"

অতঃপর স্ত্রী খাদীজা (রা) রাসূল (সা)-কে নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা বিন নাওফালের নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি ছিলেন একজন বয়োবৃদ্ধ অন্ধ। তিনি জাহিলিয়্যাতের যুগে ক্রিস্টান ধর্ম গ্রহন করেছিলান। তাওরাত-ইঞ্জিল লিখতে পড়তে জানতেন। রাসুলুল্লাহ (সা) তাকে হেরা গুহার সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। ওয়ারাকা বলেছিলেন, 'ইনি তো সেই নামূস (ফেরেশতা জিব্রীল), যিনি মূসার নিকট অবতীর্ণ হতেন। হায়! যেদিন আপনাকে আপনার স্বজাতি দেশ থেকে বের করে দেবে, সেদিন যদি আমি জীবিত ও যুবক থাকতাম।'

এ কথা শুনে রাসূল (সা) বললেন,"তাঁরা কি আমাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করবে?" ওয়ারাকা বললেন, 'হ্যা। আপনার মত যে কেহই এ সত্য আনয়ন করেছেন, তিনিই নির্যাতিত হয়েছেন। আমি যদি সেই সময় পর্যন্ত জীবিত থাকি, তাহলে আপনার সর্ব প্রকার সহযোগিতা করব।' কিন্তু এর অল্পকাল পরেই ওয়ারাকা মৃত্যুবরণ করেন। (বুখারী ৩, মুসলিম ৪২২)

এইভাবে স্ত্রী স্বামীর ভীতির সময় সহযোগিতা করেছিলেন। ইসলামের প্রভাতকালে তাকে সাহস দিয়েছিলেন, সহযোগিতা করেছিলেন। ঈমান ও বিশ্বাস দিয়ে তাঁর মনকেসরল ও সমৃদ্ধ করেছিলেন। এছাড়াও ইসলামের প্রথম দিনেই ঈমান এনেছিলেন তাঁর আযাদকৃত দাস যায়িদ বিন হারিসা(রা), তাঁর চাচাত ভাই আলী বিন আবু তালিব (রা) ও তাঁর সাওর গুহার সঙ্গী আবু বকর সিদ্দীক(রা)।

রাসূল (সা) বলেন, “আমি যাকেই ইসলামের দাওয়াত দিয়েছি, তাঁর মনেই প্রথমে কিছু না কিছু দ্বিধা-দ্বন্দের সৃষ্টি হয়েছে, একমাত্র আবু বকর ব্যতীত। আমি তাকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া মাত্র তিনি বিনা দ্বিধায় সাথে সাথে তা কবুল করেন।“ আবু বকর (রা) ছিলেন বিশেষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, জ্ঞানী ও বিচক্ষন ব্যাক্তি। সম্প্রদায়ের সমস্ত লোক তাঁর উত্তম চরিত্র ও সদ্ব্যবহারে মুগ্ধ ছিল। তিনি রাসুল (সা)-এর নির্দেশে প্রথম মুসলিমদের ইমামতি করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় নিম্লিখিত ব্যক্তিবর্গ যথাক্রমে ইসলাম গ্রহন করেন-

সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা), উসমান ইবনে আফফান(রা), উবাইদ ইবনে যায়েদ(রা), তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ(রা), যুবায়ের(রা), আব্দুর রহমান(রা), উসমান ইবনে মাযউন(রা), আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ(রা), খালিদ ইবনে সাইদ(রা), আবু সালামা(রা)। তিনি বহু ক্রীতদাস খরিদ করে মুক্ত করে দেন যার মধ্যে বিলাল(রা) ও ছিলেন। মক্কায় কঠিন ও বিপদসংকুল জীবনে তিনি নবীজি(সা)-কে সর্বত্র ও সর্ব অবস্থায় এমনভাবে সঙ্গদান করেন যে, ইতিহাস পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টান্ত উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়ে যায়। তিনিই ছিলেন উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-এর পিতা।

সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহনকারী যুবক ছিলেন হযরত আলী(রা)। হযরত আলী (রা) তাঁর জীবদ্দশায় সংঘটিত প্রায় সমস্ত যুদ্ধেই অংশগ্রহন করে বিস্ময়কর ভূমিকা পালন করেন। তিনি বীরত্ব ও সাহসীকতার এমন অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, যা আজ ও উদাহরন হয়ে আছে। বদর যুদ্ধে তিনি তাঁর প্রতিপক্ষ শায়বাকে একই আঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত করেন। খন্দক যুদ্ধে তিনি একাই কাফেরদের হাজার সেনার সমকক্ষ আমর ইবনে আবদে বুদকে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে হত্যা করেছিলেন। হুদায়বিয়া নামক স্থানে রাসূল (সা)-এর নিজ কন্যা ফাতিমা (রা) কে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। এতে করে তিনি রাসূল (সা)-এর অধিকতর ঘনিষ্ট হয়ে যান।

হযরত হামজা (রা) ও উমার (রা)-এর ইসলামগ্রহন

নবুওয়্যাতের ৬ষ্ঠ বছরের ঘটনা। একদিন আবু জাহল সাফা পর্বতের নিকটে নবীজী(সা) এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে রাসূল (সা) কে অপমানসূচক কথাবার্তা বলল এবং একটি পাথর তুলে নবিজি (সা) এর মাথায় আঘাত করল। ফলে আঘাতপ্রাপ্ত স্থান থেকে রক্তধারা প্রবাহিত হতে লাগল। এরপর সে কাবাগৃহের নিকটে কুরাঈশদের বৈঠকখানায় গিয়ে যোগদান করল। হামজা (রা) শিকার থেকে ফিরে এই ঘটনা জানতে পেরে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হন। তিনি ছিলেন কুরাঈশদের মধ্যে মহাবীর এবং মহাবলশালী এক যুবক। তিনি আবু জাহলকে মাসজিদুল হারামে খুজে পেলেন এবং তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বল্লেন,'ওহে গুহ্যদ্বার দিয়ে বায়ূ নিঃসরণকারী! আমার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মাদ (সা) কে তুমি গালি দিয়েছ এবং পাথর দিয়ে আঘাত করেছ। অথচ আমি তাঁর দ্বীনেই আছি।'

এরপর তিনি কামানের দ্বারা তাঁর মাথার উপর এমনভাবে আঘাত করলেন যাতে সে আহত হয়ে গেল। ফলে বনু মাখযুম ও বনু হাশিম গোত্রদ্বয় একে অপরের প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।। আবু জাহল তাঁদেরকে নিরস্ত করে বল্ল, আবু উমারাকে যেতে দাও। আমি সত্যিই তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে গালমন্দ ও আঘাত দিয়েছি।

প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর ইসলামগ্রহনের ব্যাপারটি ছিল কিছুটা নবিজি(সা) এর প্রতি আবেগের উৎস থেকে উৎসরিত। পরে আল্লাহ তাঁর অন্তরে ইসলাম প্রীতি জোরদার করে দেওয়ায় তিনি দ্বীনের রশি মজবুত করে ধরলেন।

তাঁর ইসলামগ্রহনের মাত্র ৩ দিন পর আরব জাহানের তেজস্বীপুরুষ উমার বিন খাত্তাব (রা) ইসলামগ্রহন করেন। ইমাম তিরনিযী আব্দুল্লাহ বিন উমার (রা) হতে বর্ণনা করেছেন এবং তাবারাণী ইবনু মাসউদ(রা) এবং আনাস (রা) মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন- নবিজি (সা) বলতেন,"হে আল্লাহ! উমার বিন খাত্তাব অথবা আবু জাহল বিন হিশাম এর মধ্য হতে যে তোমার নিকট অধিক প্রিয় তাঁর দ্বারা ইসলামকে শক্তিশালী করে দেও।" (তিরমিযী আরওআবুল মানাকের আবীহাফস ওমর বিন খাত্তাব ২য় খন্ড ২০৯পৃ)

দ্বীনের পথে সাহাবাদের প্রচেষ্টা, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও কুরবানী

দ্বীন ইসলামের আলো ছড়াতে রাসূল (সা) এবং তাঁর সাহাবাগণ যেসব অত্যাচার, নির্যাতন অ কষ্ট ভোগ করেছেন তা আমাদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। নবীজি(সা)-এর নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পর সেই কঠিন দিন গুলোতে তাঁর পাশে দাড়িয়েছেন বিশিষ্ট অগ্রনী সাহাবাগণ। আল্লাহ তায়ালা পবিতে কুরআনে তাঁদের প্রসংশা করে বলেন-

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

“আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনছারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কানন-কুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা।“(আত-তাওবাহ ১০০)

পঞ্চম মতান্তরে অষ্টম হিজরীর একটি ঘটনা। রাসূল (সা) আবু উবাইদ ইবনুল জাররাহ (রা)-এর অধীনে মুহাজির-আনসারসহ সম্মিলিত তিনশ মুজাহিদের একটি বাহিনী নিয়ে মদিনা হতে পাঁচ দিনের পথে সমুদ্র উপকূল অঞ্চলে বসবাসকারী জুহাইনা কওমের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ঘটনাক্রমে এ যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পড়ে ফলে ক্রমশ গভীর খাদ্যসংকট শুরু হয়। প্রথম দিকে দৈনিক তিনটি করে উট যবেহ করা হচ্ছিল, কিন্তু বাহন কমে যাওয়ার আশংকায় উট যবেহ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। তখন বরাদ্দ হতে থাকে জনপ্রতি কিছু কিছু খেজুর। কিন্তু যখন তাতেও অনটন দেখা দেয়, তখন বরাদ্দ হল মাথাপিছু একটি খেজুর। তা চুষে পানি পান করে মুজাহিদগণ জিহাদ করতে থাকেন। যখন খেজুরও শেষ হয়ে যায়, তখন তাঁরা গাছের পাতা খাওয়া শুরু করলেন। দ্বীনের জন্য রাসূল(সা) ও তাঁর সাহাবীগণ যে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ও অভাব অনটনের মধ্যে দিন কাটিয়ে যেভাবে দৃঢ়তা দেখিয়াছেন, ধৈর্য্য অবলম্বন করেছেন- তেমন আত্মোৎসর্গের পরিচয় অন্য কোন নবী ও তাঁর উম্মতের মধ্যে দেখা যায় না।

নবুওয়্যাতের প্রাথমিক অবস্থায় অন্যায় অত্যাচারঃ কোন কৌশলই যখন কার্যকর হচ্ছিল না, আরবের নেতা ও গোত্রপতীদের অধীনে ইতর ও নিম্নশ্রেণীর লোকদের মুসলিমদের উপর লেলিয়ে দিত। বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে যার দরিদ্র তাঁদের উপর অত্যাচারের স্টীমরোলার চালাত। তারা তাঁদের শরীর থেকে চামড়া ছিলে ফেলা সহ এমন সব পাশবিক আচরন করত

যা পাষাণ ব্যক্তি ও প্রত্যক্ষ করে অস্থির কিংবা বিচলিত হয়ে পড়ত। আবু জাহল যখন কোন সম্ভ্রান্ত বা শক্তিধর ব্যাক্তির মুসলিম হওয়ার কথা শুন্ত তখন সে তাকে ন্যায় অন্যায় বলে গালি গালাজ করত, অপমান-অপদস্থ করত এবং ধন্সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি করবে বলে ভয় দেখাত। জ্ঞাতি গোষ্ঠীর যদি কোন দুর্বল ব্যক্তি মুসলমান হত তাকে সে অত্যন্ত নির্দয়ভাবে মারধোর করত।

উসমান বিন আফফানের (রা) চাচা তাকে খেজুর পাতার চাটাইয়ের মধ্যে জড়িয়ে রেখে নিচ থেকে আগুন লাগিয়ে ধোঁয়া দিত। মুস’আব বিন উমায়ের (রা) এর মা যখন তাঁর ইসলাম গ্রহনের খবর পেল তখন সে তাঁর খানাপিনা বন্ধ করে দিল এবং তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিল। প্রথম জীবনে তিনি আরাম-আয়েশ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে লালিত- পালিত হয়েছিলেন। কিন্তু ইসলাম গ্রহনের পর তিনি এতই কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হন যে সাপের গাত্র থেকে খুলে পড়া খোলসের মত তাঁর শরীরের চামড়া খুলে খুলে পড়ত।

বিলাল (রা)-এর ইসলামগ্রহনের পর অমানবিক নির্যাতনঃ উমাইয়া বিন খলফ ইসলামের ঘোর শত্রু ছিল। সে তাঁর দাস বিলাল(রা) কে ইসলাম ত্যাগ করাতে অত্যন্ত কঠোর ও নির্মম শাস্তি দিত। দুপুরের কড়া রোদে উত্তপ্ত অগ্নিঝরা গরম বালির উপর সে হযরত বিলাল (রা) কে চিত করে শুইয়ে তাঁর বুকের উপর একটি বড় পাথর চাপিয়ে দিত। খানাপিনা না দিয়ে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত রাখত। এমন অসহনীয় নির্যাতন ভোগ করেও তিনি ইসলাম পরিত্যাগ করেননি। প্রাণ ওষ্ঠাগত প্রায়, অসহ্য যন্ত্রনায় ছটফট করতে করতে চিৎকার দিয়ে বলতেন, আহাদ, আহাদ অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। রাত্তেও তাঁর শান্তি ছিল না। তাকে যখন বেত মারা হত, ফলে আগের দিনের জখম গুলো তরতাজা হয়ে উঠত। পরেরদিন তাকে একইভাবে শাস্তি দেয়া হত, ফলে তাঁর জখম থেকে অঝোর ধারায় রক্ত প্রবাহিত হত। তারা তাঁর গলায় দড়ি বেধে মক্কার রাজপথে টেনে হিচড়ে নিয়ে যেত আর সন্ধ্যার দিকে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফিরিয়ে দিয়ে যেত। তাকে নির্যাতন শুধুমাত্র তাঁর মনিবই করত এমন নয়, সাথে কখনও আবু জাহল, কখনও উমাইয়া কখনও অন্য কাফেররা পালাক্রমে অত্যাচার করত। এত নির্যাতন সত্ত্বেও তিনি কখনও তাঁর আহাদকে ভুলেন্নি। তাঁর এ অবস্থা দেখে আবু বকর (রা) বহু অর্থের বিনিময়ে তাকে আযাদ করে দেন। ইতিহাসের পাতায় বিলাল (রা) যে ধৈর্য্য, সততা ও আন্তরিকতার চিত্র অঙ্কিত করে গেছেন তা প্রতিটি মুসলিমের জন্য চিরকালের মত মশাল হিসেবে গন্য হবে।

ইসলাম প্রকাশকারী প্রথম সাহাবা খাব্বাব (রা)-এর ঘটনাঃ খাব্বাব (রা) যখন ইসলামগ্রহন করেন, তখন শুধুমাত্র পাঁচজন ইসলাম কবুল করেছিলেন। তাঁরা ছিলেন- খাদীজা (রা), আবু বকর (রা), আলী (রা), যায়েদ ইবনে হারেসা (রা) ও আবু জর গিফারী(রা)।

খাব্বাব(রা) ছিলেন উম্মে নাসার বিন্তে সাব আল খোযারীর দাস। তিনি মক্কায় কর্মকারের কাজ করতেন এবং তলোয়ার তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে যথেষ্ট উপার্জন করতেন। ইসলাম গ্রহনের পর কাফেররা তাঁর উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চালায়। তাকে জ্বলন্ত কয়লার উপর শুইয়ে দিয়ে একজন বিরাট লোক তাঁর বুকের উপর চেপে বসত যাতে তিনি পাশ ফিরতে না পারেন। তাঁর মালিক উম্মে নাসার লোহার দ্বারা তাঁর মাথায় দাগা দিত। একবার তিনি রাসূল (সা) এর কাছে নিবেদন করলেন,'ইয়া রাসুলুল্লাহ(সা), দুয়া করুন, যাতে আল্লাহ আমাকে এ আযাব হতে নাযাত দান করেন।'। রাসুল(সা) দুয়া করলেন, "হে আল্লাহ খাব্বাবকে সাহায্য কর।" কিছুদিন পর উম্মে নাসার অসুস্থ হয়ে ছটফট করতে করতে মারা যায়। খাব্বাব (রা) প্রাথমিক যুগেই কুরআন শিক্ষা করেছিলেন। উমার (রা)-এর বোন ও ভগ্নিপতিকে তিনিই কুরআন পড়াতেন।

হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) এবং তাঁর পিতা মাতার ঘটনাঃ কাফেরদের হাতে অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন আম্মার(রা) ও তাঁর পিতা মাতা। উত্তপ্ত মরুর বালির উপর শুইয়ে রেখে তাকে নির্যাতন করা হত। আম্মার (রা) ছিলেন বনু মাখযুমের ক্রীতদাস। ইসলাম গ্রহন করায় তাঁর ও তাঁর পিতা মাতার উপর চরম অত্যাচার করা হয়। তাঁর এ অবস্থা দেখে রাসুল (সা) তাকে সবর করতে বলতেন এবং বেহেশতের সুসংবাদ দিয়ে তাকে সান্ত্বনা প্রদান করতেন। শাস্তি চলা অবস্থায় ইয়াসির (রা) ইন্তিকাল করেন। তাঁর মা সুমাইয়া (রা) কে আবু জাহল অত্যাচারের এক পর্যায়ে লজ্জাস্থানে বর্শার আঘাত করে হত্যা করে। তিনিই ছিলেন ইসলামের প্রথম মহিলা শহীদ।

আবু ফুকাইহাহ(রা)ঃ আবু ফুকাইহাহ(রা) বনু আব্বাস গোত্রের দাস ছিলেন। ঈমান আনার কারনে তাঁর মালিক তাকে পায়ে লোহার শিকল বেধে, শরীর হতে কাপড় খুলে নিয়ে কংকরময় পথ ও প্রান্তরে টেনে নিয়ে বেড়াতেন। এরপর তাঁর পিঠের উপর ভারি পাথর চাপা দিত ফলে তিনি নড়াচড়া করতে পারতেন না। এভাবে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলতেন। অতঃপর তিনি হাবশায় হিজরতকারী দ্বিতীয় কাফেলার সাথে হিজরত করেন। একবার তাঁরা তাঁর পায়ে রশি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে উত্তপ্ত ময়দানে নিয়ে তাঁর গলায় ফাঁস লাগাল। এতে কাফেররা ধারনা করল তিনি(রা) মারা গেছেন। ইত্যবসরে আবু বকর (রা) সে পথ দিয়ে যাওয়ার সময় তাকে ক্রয় করে আল্লহর ওয়াস্তে আযাদ করে দিলেন।

যিন্নীরাহ(রা)ঃ রুমী কৃতদাসী যিন্নীরাহ ইসলাম গ্রহন করলে তাকে শাস্তি দেয়া হয়। তাকে চোখে আঘাত করা হয় ফলে তিনি অন্ধ হয়ে যান। অন্ধ হওয়ার পর তাকে বলা হল তোমাকে লাত ও ওযযার আসর লেগেছে। উত্তরে যিন্নীরাহ বললেন, আল্লহর কসম! আমাকে লাও ও ওযযার আসর লাগেনি। বরং এটা আল্লহর এক্তা অনুগ্রহ এবং আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় তা

ভাল হয়ে যাবে। অতঃপর একদিন সকালে দেখা গেল যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর চোখ ভাল করে দিয়েছেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে কুরাঈশরা বল্ল, এটা মুহাম্মাদ (সা) এর একটা যাদু।

বয়কট ও শিয়াবে আবু ত্বালিব গিরিসংকটে অবস্থানঃ এ ঘটনা আনুমানিক নবুওয়্যাতের সপ্তম বর্ষের মুহাররম মাসের। মুশরিকদের সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হল তখন তারা পরামর্শ করে বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবকে বয়কট করল অর্থাৎ তাঁদের সাথে ক্রয়-বিক্রয়, সামাজিক কার্যকলাপ, অর্থনৈতিক আদান প্রদান, কুশল বিনিময় সব বন্ধ করে দিল। ফলে আবু লাহাব ব্যাতীত গোত্রদ্বয়ের কাফের মুসলিম সকলে শিয়াবে আবু ত্বালিব গিরি সংকটে আশ্রয় নিল। তাঁদের খাদ্যশস্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সামগ্রী আমদানী ও পানীয় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কারন খাদ্যশস্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী যা মক্কায় আসত মুশরিকরা তা তাড়াহুড়া করে ক্রয় করে নিত। এ কারনে গিরিসংকটে অবরুদ্ধদের অবস্থা করুন হয়ে গিয়েছিল। খাদ্যাভাবে তাঁরা গাছের পাতা, চামড়া ইত্যাদি খেতে বাধ্য হল। কোন কোন সময় উপবাসেও থাকতে হতো। এভাবে দীর্ঘ ২ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর নবুওয়্যাতের ১০ম বর্ষে অংগীকারনামা ছিড়ে ফেলা হয় এবং অত্যাচার উৎপীড়নের পরিসমাপ্তি ঘটানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। অবশেষে কিছু কল্যানকামী ব্যাক্তির দীর্ঘ প্রচেষ্টায় এ কাজটি সফল হয়।

সাহাবীগণের হিজরতঃ নবুওয়্যাতের পঞ্চম বর্ষে যখন মুসলিমদের উপর জুলুম নির্যাতনের মাত্রা বেড়েই চলছিল শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থার সৃষ্টি হল যে, মক্কায় মুসলিমদের টীকে থাকাই কঠিন হয়ে গিয়েছিল। এমন ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে অবতীর্ণ হল যুমার।

قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

“বলুন, হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর। যারা এ দুনিয়াতে সৎকাজ করে, তাদের জন্যে রয়েছে পুণ্য। আল্লাহর পৃথিবী প্রশস্ত। যারা সবরকারী, তারাই তাদের পুরস্কার পায় অগণিত।“ (আয যুমার ১০)

অবশেষে রাসূল (সা) সাহাবীদেরকে আবিসিনিয়ায় সম্রাট নাজ্জাশীর রাজত্বে হিজরত করার নির্দেশ প্রদান করেন।

জিহাদের ময়দানে সাহাবাদের বীরত্বের নমুনা

বদর যুদ্ধের সময় রাসূল(সা) সাহাবায়ে কেরামগণকে যুদ্ধের প্রতি উৎসাহ ও বীরত্বের প্রেরণা দিয়ে তিনি একখানা অত্যন্ত ধারালো তরবারি হাতে নিয়ে বললেন, “কে এটা গ্রহন করবে? কে এর মর্যাদা রক্ষা করবে?’ বলা বাহুল্য যে, ঐ তরবারীখানা গ্রহনের জন্য চারদিক থেকে কয়েকশ বাহু ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়েছিল যার মধ্যে আলী ইবনে আবু তালিব, জুবায়ের ইবনু আউয়াম এবং উমার ইবনু খাত্তাব(রা) ও ছিলেন। কিন্তু তা গ্রহনের জন্য আবু দুজানাহ সিমাক ইবনু খারাশাহ(রা) সবার আগে অগ্রসর হলেন এবং বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল (সা) এ তরবারীর হক কী?’ রাসূল(সা) বল্লেন,”এর দ্বারা তুমি শত্রুদের মুখমন্ডলে এমনভাবে মারবে যেন তা বেকে যায়।“ তখন তিনি বললেন,’হে আল্লাহর রাসূল(সা), আমি এর হক আদায় করব।‘ তখন তলোয়ারটি তাঁর হাতে দিয়ে দেয়া হল।

সাহাবী হানযালা(রা) উহুদ যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নববিবাহিত স্ত্রী কে রেখে জানাবাত অবস্থায়ই যুদ্ধে শরীক হন। যুদ্ধের ময়দানে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করতে করতে তিনি আবু সুফিয়ানের একেবারে নিকটে পৌছে গিয়েছিলেন। আবু সুফিয়ানকে তরবারীর আঘাত করতে যাবেন এমন সময় শাদ্দাদ ইবনে আওস তাকে শহীদ করে দেন। যুদ্ধের পর সাহাবীগন দেখেন যে, তাঁর লাশ শুন্যে ভাসন্ত অবস্থায় তা থেকে পানি গড়িয়ে পড়ছে। সাহাবীগণ এ দৃশ্য রাসুল(সা) কে জানালে তিনি হানযালা (রা) এর স্ত্রীকে ব্যাপারটি জিজ্ঞেস করলেন। তার স্ত্রী জানালেন যে, হানযালা (রা) জানাবাত অবস্থায় যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। রাসূল (সা) বললেন, ফেরেশতারা তাকে গোসল দিচ্ছিল। এজন্য তাঁর নাম হয়ে যায় হানযালাতুল গাসীল।

এ যুদ্ধে হামযা (রা) অত্যন্ত বীরত্বের সাথে মুশরিকদের কচুকাটা করে যাচ্ছিলেন। ওয়াহশি ইবনু হারব নামে এক গলাম কাপুরুষের মত পেছন থেকে বর্শা মেরে তাকে শহীদ করে। বর্শা তাঁর নাভির নিচে লাগে এবং দুপায়ের মাঝ দিয়ে ভেদ করে বের হয়ে যায়। এভাবে বীরত্বের সাথে লড়াই করে রাসূল (সা) এর চাচা শহীদ হয়ে যান।

উহুদ যুদ্ধের এক পর্যায়ে রাসুল (সা) এর মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ ছড়িয়র পড়ে ফলে মুসলিম বাহিনী মনোবল হারিয়ে ফেলে। আনাস ইবনু নাযার রাঃ বলেন, 'জান্নাতের সুগন্ধি সম্পর্কে আর কি বলবো? আমি তার সুখ অনুভব করছি'। এরপর তিনি যুদ্ধে এগিয়ে গেলেন এবং মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে গেলেন। তার শরীরে বর্শা, তরবারি এবং তীরের ৮০ টিরও বেশি আঘাত লেগেছিল। যুদ্ধশেষে তাকে চেনা যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত তার বোন শুধুমাত্র তার আঙ্গুলের অগ্রভাগ দেখে তাকে চিনতে পারেন।

একইভাবে সাবিত ইবনু দাহদাহ রাঃ তাঁর কওমকে বললেন, 'যদি মুসলমান হয়ে থাক তবে জেনে রেখো, রাসূলুল্লাহ সাঃ জীবিত রয়েছেন, তিনি মরতে পারেন না। তোমরা তোমাদের মতো যুদ্ধ করে যাও; আল্লাহ তোমাদের সাহায্য ও বিজয় দান করবেন। একথা শুনে আনসারদের একটি দল উঠে পড়েন এবং তার নেতৃত্বে খালিদ বিন ওয়ালিদের বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। যুদ্ধ করতে করতে তিনি শহীদ হয়ে যান। একজন মুহাজির সাহাবী একজন আনসার সাহাবীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি রক্তে রঞ্জিত হয়ে গিয়েছিলেন। মুহাজির তাকে বললেন, 'হ্যাঁ ভাই, আপনি কি অবগত আছেন যে মুহাম্মাদ নিহত হয়েছেন?' তখন আনসার বললেন, যদি মুহাম্মদ নিহত হয়ে থাকেন তবে জেনে রাখুন তিনি আল্লাহর দ্বীন পৌঁছে দিয়েছেন। এখন আপনাদের কর্তব্য হলো সেই দ্বীনের হেফাজতের জন্য যদ্ধ করা। এই ধরনের সাহস এবং উদ্যম বৃদ্ধিকারী কথা এবং কতিপয় সাহাবীর অতুলনীয় উদ্যোগে মুসলিমরা তাদের হারানো মনোবল ফিরে পায় এবং রাসূলুল্লাহর ডাক শোনার সাথে সাথে দ্বিগুণ উদ্যোম নিয়ে তারা পুনরায় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুসলিমদের একটি দল যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল তারা মুশরিকদের সাথে মিশে গিয়েছিল আর এর ফলে অনেক মুসলিম অপর মুসলিমের হাতে যুদ্ধে নিহত হয়। সহিহ বুখারীর একটি বর্ণনায় রয়েছে, উহুদ যুদ্ধের দিন হুজাইফা রাঃ দেখলেন তাঁর পিতা ইয়ামানের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। তিনি তখন বলে উঠলেন, 'হে আল্লাহর বান্দাগণ, ইনি যে আমার পিতা'। কিন্তু তিনি যে মুসলিম তা বললেন না ফলে তারা বিরত হলেন না। তারা শেষপর্যন্ত তাকে হত্যা করেছিলেন। হুজাইফা রাঃ এর মধ্যে সদাসর্বদা কল্যান বিরাজমান ছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি আল্লাহর সাথে মিলিত হন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল সাঃ তাঁর দীয়াত (রক্তপণ) দিতে দিয়েছিলেন কিন্তু হুজাইফা রাঃ বলেন যে, 'আমি তাঁর দীয়াত মুসলিম জাতিকে সাদাকা করে দিলাম'।

রাসূল সাঃ-এর কণ্ঠস্বর শুনেই মুশরিকরা তাকে চিনে ফেলে এবং তারা এই সুযোগ হাতছাড়া না করার জন্য দ্রুত গতিতে রাসূল সাঃ-এর দিকে ধাওয়া করে। রাসূল সাঃ সাহাবীদেরকে ডাক দিয়েছিলেন কিন্তু সাহাবীদের পূর্বেই মুশরিকরা রাসূল সাঃ-এর নিকট পৌঁছে যায়।

এসময় রাসূল সাঃ-এর কাছে মাত্র সাতজন আনসার এবং দুইজন কুরাইশ সাহাবি ছিলেন। তখন তিনি বললেন, "এমন কেউ কি আছে যে, এদেরকে আমার নিকট থেকে দূর করে দিতে পারে? তার জন্য জান্নাত রয়েছে"; ভিন্ন বর্ণনায় রয়েছে, "সে জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে"। রাসূল সাঃ-এর কথা শুনে পরপর ৭ জন আনসারী সাহাবী যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে যান এভাবে তাদের সাতজনকে চোখের সামনে শহীদ হতে দেখে রাসূল সাঃ বললেন, "আমরা আমাদের সঙ্গীদের সাথে ন্যায় বিচার করলাম না"। যে দুজন কুরাইশ সাহাবী রাসূল সাঃ-এর কাছে ছিলেন তাঁরা হলেন তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ রাঃ এবং সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস রাঃ। মুশরিকরা সুযোগ বুঝে রাসূল সাঃ-এর উপর তাদের সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

- উতবা ইবনে আবি ওয়াক্কাস একটি পাথর মেরে রাসূল সাঃকে পার্শ্বদেশের ভরে ফেলে দেন আর এর ফলে রাসূল সাঃ-এর ডান দিকের রুবাঈ দাঁত ভেঙে যায় এবং রাসূল সাঃ-এর নিচের ঠোঁট আহত হয়।
- আব্দুল্লাহ ইবনে শিহাব যুহরী (তিনি পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মক্কায় ইন্তিকাল করেন)। রাসূল সাঃ-এর ললাট বরাবর পাথর দিয়ে আঘাত করে। ফলে রাসূল সাঃ এর কপাল ফেটে রক্ত বের হতে থাকে।
- আব্দুল্লাহ ইবনু কামিয়াহ নামক এক দুর্ধর্ষ ঘোড়সওয়ার রাসূল সাঃ-এর ঘাড়ের উপরে এত জোরে তরবারির আঘাত করেন যে, রাসূল সাঃ একমাসেরও বেশি সময় তার ব্যথা অনুভব করতেন। তবে লৌহবর্ম পরিহিত থাকায় তিনি বেঁচে যান। এরপর আব্দুল্লাহ দ্বিতীয়বার রাসূল সাঃকে আঘাত করেন এর ফলে রাসূল সাঃ-এর চেহারার মধ্যে শিরস্ত্রাণের দুটি কড়া ঢুকে যায়। রাসূল সাঃ তার চেহারা থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বলেন, "আল্লাহ তোকে টুকরো টুকরো করে ফেলুন"। রাসূল সাঃ-এর এই দোয়া আল্লাহ কবুল করেছিলেন।

ইবনু কামিয়া যুদ্ধ থেকে বাড়ি ফেরার পর পাহাড়ের উপরে তার বকরি খুঁজতে যায়। সে সময় এক পাহাড়ি বকরি তাকে আক্রমণ করে এবং মারতে মারতে পাহাড়ের উপর থেকে নিচে ফেলে দেয়। ভিন্ন বর্ণনায় আছে-পাহাড়ি বকরি তাকে শিং দিয়ে মারতে মারতে টুকরো টুকরো করে দেয়।

মুশরিকদের আঘাত পাওয়ার পরে রাসূল সাঃ তার মুখমন্ডল থেকে রক্ত মুছছিলেন আর বলছিলেন, "ওই কওম কীরূপে কৃতকার্য হতে পারে যারা তাদের নবী সাঃ এর মুখমণ্ডলে আঘাত করেছে এবং তার দাঁত ভেঙে দিয়েছে অথচ তিনি তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকছিলেন"। এই প্রেক্ষিতে আল্লাহ আয়াত নাযিল করলেন-

ليس لك من الأمر شيء أو يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

অর্থঃ "আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হবেন অথবা শাস্তি দেবেন এ ব্যাপারে তোমার কিছু করার নেই: কেননা তারা হচ্ছে জালেম"। (সূরা আলে ইমরান, ৩:১২৮)

সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল সাঃ বারবার বলছিলেন, "হে আমার প্রতিপালক, আমার কওমকে ক্ষমা করে দিন কারণ তারা জানে না"।

রেফারেন্স

- কুরআন-সুন্নাহর আলোকে সাহাবায়ে কেরামের শান ও মর্যাদা

সাহাবা চরিত ১ম খন্ড

লেখকঃ মোহাম্মাদ যাকারিয়া (রহি)

- সীরাতে ইবনে হিশাম ১ম খন্ড

আবু মুহাম্মদ আব্দুল মালিক ইবনে হিশাম (রহি)

- সাহাবায়ে কিরাম

আব্দুল হামীদ মাদানী

- আল হাদিস (Al Hadith) - Read Hadith Online | iHadis.com
- রহমাতুল্লিল আলামিন

সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী (রহি)

- আর-রাহীকুল মাখতুম(তাওহীদ পাব্লিকেশন)

শাইখুল হাদীস আল্লামা শফিউর রহমান মোবারকপুরী(রহি)